যুগান্তর

তারিখ 25 JUL 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

// লিপন কুমার মণ্ডল

বিশ্ববিদ্যালয় বদলানো গেলে দেশ বদলাবে

প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলাদেশের জন্মের সূতিকাগার মনে করতেন। বাংলাদেশের জন্মের পেছনে দ্বিতীয় যে কারণটিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় সেটি হল আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন, যা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অংশ। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭১, ১৯৮৯সহ জাতীয় জীবনে যে কোনো দুর্দিনে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এসব আন্দোলনের পাশাপাশি জাতি গঠনে তথা সমাজের সব গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের জন্য দক্ষ ও মেধাবী জনসম্পদ তৈরির কাজে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অপরিসীম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ১৯৭১-এর আগে প্রতিষ্ঠিত ৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী ৪৫ বছরে আরও ৩১টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও জাতীয় জীবনে অসামান্য ভূমিকা রেখে আসছে। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের (৮৫টি) মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানই নানাভাবে দেশ ও জাতির কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে গত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। তাই আজকের রাজনৈতিক সংকট তথা সমগ্র সমাজকে নানা ধরনের রাহুগ্রাস থেকে বাঁচাতে বিশ্ববিদ্যালয়কেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে নেতৃত্বে।

বর্তমানে দেশে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সার্বিক অর্থনীতি নিয়ে কার্যকর গবেষণা করে যাচ্ছে। তাই দেশের অর্থনীতিতে কখন কী ঘটছে আমরা জানতে পারছি। কিন্তু এসব অর্থনৈতিক গবেষণার পাশাপাশি আমাদের বৃহত্তর পরিসরে গবেষণা দরকার সমাজ, রাষ্ট্র, সরকার, রাজনীতি, আমলা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নদী, সমুদ্র, বন, ভূমি, জলাভূমি, কৃষি, জ্বালানি-সম্পদ, পশু-সম্পদ, ব্যবসায়িক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসহ নানা বিষয়ে। এসব নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা না থাকায় সমাজের ভেতর ও বাইরের ঘটনা আমাদের অজানাই থেকে যাচ্ছে; তদুপরি গত ৪৫ বছরে আমরা রাজনৈতিক সংস্কৃতির কোনো গঠনমূলক পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছি।

দেশে নতুনধারার নেতৃত্ব সন্নিকটে এ রকম ভাবার কোনো কারণ নেই অথবা রাতারাতি রাজনৈতিক সংস্কৃতি তথা প্রচলিত গণতন্ত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে এ রকম সম্ভাবনা আপাতত নেই। মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদদের সমাজ পরিবর্তনের সূত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশে বর্তমানে সমাজের আমূল কোনো পরিবর্তন আনতে সক্ষম এ রকম উপাদানগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে। কারণ সমাজ পুঁজিবাদের প্রথম স্তর তথা আদিম পুঁজি-সঞ্চয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই একটি গোষ্ঠী অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন, অর্থ পাচার, ব্যাংক ডাকাতি, নদী-খাল-বিল-সমুদ্র দখল প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত, অন্য একটি বড় গোষ্ঠী এসবের ভাগ পেতে সচেষ্ট। তাই এ বন্টন দেখা যায় অসাধু ব্যবসায়ী, চোরাকারবারি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ক্ষমতাধর লোকের মধ্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত, বিশেষ বিশেষ অফিসের কর্মকর্তা থেকে পিয়ন পর্যন্ত। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকলে এ দেশে গণতন্ত্র কোণঠাসা হয়েই থাকবে, বিরোধী দলের নিয়তি দমন-পীড়নের মধ্যেই আটকে থাকবে, গত ২৫ বছর এর পরীক্ষিত উদাহরণ।

আবার নব্য-মার্কসবাদীদের মতে, দেশের এসব অর্থবিত্ত ভাগবাটোয়ারার কাজে সিভিল সোসাইটির উল্লেখযোগ্য একটি অংশ নানাভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন (যারা কম্প্রাডর বুর্জোয়া নামে পরিচিত) এবং এ থেকে সুবিধা ভোগ করেন। নব্য-মার্ক্সবাদী এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকদের মতে, বাম-আন্দোলন এসব লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকলেও তারা সমন্বিতভাবে কোনো বড় ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ জনগণকে তারা এক মঞ্চে আনতে পারেননি। বাকি থাকে সাধারণ মানুষ, যাদের মধ্যে অনেকে রাজনীতির সুবিধা পেয়ে থাকেন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে, আর কেউ কেউ চুপচাপ জীবন ভালোবাসেন। আর নব্য উদারতাবাদী দর্শন ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা সগর্বে প্রচার করলেও এ শক্তি যে গণতন্ত্রকে শত্রু-চোখে দেখে তা বিখ্যাত সমাজ চিন্তাবিদ ডেভিড হার্ভি এবং উলিয়াম রবিনসনের গবেষণায় পরীক্ষিত। বাংলাদেশের পুঁজিবাদ প্রাথমিক স্তর বা আদিম পুঁজি-সঞ্চয়নের মধ্যে থাকলেও নব্য উদারতাবাদ অর্থনীতির দোর্দণ্ড প্রতাপ বিলক্ষণ উপস্থিত। তাই লুণ্ঠন, পাচার, ডাকাতি, দখল-বেদখল যেমন নিত্যকার ঘটনা; তেমনি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি, বিচারহীনতা; চুরি-ডাকাতি-দুর্নীতির সামাজিকীকরণ, অপরাধীর আশ্রয়দান, সর্বোপরি ফ্যাসিস্ট গণতন্ত্রের চর্চা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হচ্ছে।

> সমন্বিতভাবে দেশের সামগ্রিক স্বার্থে তথা ভবিষৎ প্রজন্মকে নিরাপদে রাখতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ থেকে শিক্ষকরা যে গবেষণা প্রবন্ধ লিখে থাকেন, তা জার্নালে অথবা বই আকারে প্রকাশের পাশাপাশি প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় গবেষণার সারসংক্ষেপ প্রকাশ করাটা গুরুদায়িত্ব মনে করতে হবে। যাতে দেশের সর্বস্তরের মানুষ সমাজের যে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। নতুন জ্ঞান তৈরি করতে পারলে মিডিয়া আকৃষ্ট হবে এবং জনগণ সজাগ হবে সব ধরনের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে।

এ রকম এক পরিস্থিতিতে দেশে তুলনামূলক স্বাধীন একটি গোষ্ঠী রয়েছে (সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্রছাত্রী) যারা চাইলেই তাদের মেধা-মনন এবং শ্রম দিয়ে দেশের মঙ্গল-সাধনে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে পারেন, বরাবরের মতোই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরাও এ কাজে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেন নিঃসন্দেহে। আর তাই বিকল্প ও টেকসই পরিবর্তন আনতে গেলে এ মুহূর্তে জ্ঞানভিত্তিক আন্দোলন দরকার, যা তৈরি করবে গণগবেষণা-সংস্কৃতি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে, দেশে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ২০ হাজার ৬৪৫ শিক্ষক এবং ৫ লাখ ৯৭ হাজার ১৪৩ ছাত্রছাত্রী আছেন। এ শিক্ষকদের, বিশেষ করে নতুন সমাজ গঠনের ব্রত নিয়ে তরুণ শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের স্বচেষ্টায় গবেষণা কাজে যোগ দিতে হবে, তাহলে হয়তো আগামী এক দশকের মধ্যেই দেশে মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। যে কোনো বিষয় সম্পর্কে গবেষণা জ্ঞান সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করবে, চোর-ডাকাত লোভ সামলাতে বাধ্য হবে, রাজনীতিক, আমলা, শিক্ষক, চিকিৎসক আরও দায়িত্ববান হতে বাধ্য হবে।

এটি কোনো ইউটোপিয়ান চিন্তা নয়, পৃথিবীর সব উন্নত দেশে এ সত্য প্রতীয়মান। দৌহমানবখ্যাত মার্গারেট থ্যাচারের শক্তিশালী শাসনব্যবস্থার পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল সমাজবিজ্ঞানী পিটার টাউন সেন্ডের দারিদ্র্যের ওপর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের পর। যুক্তরাষ্ট্রের ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিস্টিকস (বিএলএস) প্রতি মাসের প্রথম শুক্রবার সকালে তাদের জরিপে পাওয়া 'বেকার সংখ্যা' এবং 'নতুন সৃষ্ট চাকরির' তথ্য সংবলিত খবরের সঙ্গে সারা পৃথিবীর ট্রিলিয়ন ডলার শেয়ারবাজারের ভাগ্য নির্ধারিত হয়; যার প্রভাব সমাজে অকল্পনীয়। মনে রাখতে হবে, জ্ঞানের শক্তি পৃথিবীর যে কোনো রাজনৈতিক, সামরিক শক্তি থেকেও অনেক বেশি সমাজের সর্বস্তরে ক্রিয়াশীল।

এখন প্রশ্ন, স্বল্প বেতনের চাকরি দিয়ে এবং কোনো গবেষণা ভাতা ছাড়া কি গবেষণা সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। আমাদের সবাইকে যার যার স্বার্থে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা কাজ এবং প্রকাশনা করাটাকে শিক্ষক হিসেবে পবিত্র ও অবশ্য কর্তব্য কাজ বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। পরচর্চা, পরনিন্দা, দলীয় রাজনীতি, বিভাগীয় রাজনীতি— এসব আমাদের দিন-রাতের বড় একটি সময় নষ্ট করে ফেলে। আমরা চাইলে সহজেই এ সময়টুকু গবেষণায় কাজে লাগাতে পারি। যদি নিজেকে কেউ একজন সত্যিকারের শিক্ষক মনে করেন তিনি এসব কাজ করতে লজ্জিত হবেন নিশ্চয়ই। অর্থের দিক দিয়ে বড়লোক হওয়ার বা তোষামোদ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার দৌড় একজন শিক্ষক হিসেবে ভীষণ লজ্জার। মনে রাখতে হবে, গবেষণা কাজে অর্থ থেকে সময়ের বেশি প্রয়োজন, যা আমদের হাতে পর্যাপ্ত আছে।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার চাকরি হলে সেটা স্থায়ী, যা একজন শিক্ষককে হাজারও দিক দিয়ে শান্তিতে রাখে— নতুন চাকরি খোঁজা, ছেলেমেয়ের স্কুল-কলেজ বদলানো, ঘন ঘন বাসা বদলানো এসবের চিন্তা করতে হয় না। যা একজন শিক্ষককে ৩৫ বছরের শিক্ষকতা জীবনে বিরাট একটি সময় এবং মানসিক শান্তি উপহার দেয়, আমরা সেটা সৃষ্টিহীন কাজে ব্যয় করি। এ অদৃশ্য সময়টাকে আজকের তরুণ শিক্ষকদের দৃশ্যমান করে কাজে লাগাতে হবে। আমি মনে করি, সত্যিকারভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলুষ রাজনীতি তাকে আটকাবে— পরিস্থিতি এতটা খারাপ এখনও হয়নি। এরপর গবেষণা ভাতা? হ্যাঁ, সেটাও সম্ভব। বাংলাদেশের বাস্তবতার নিরিখে আমাদের দলবদ্ধ গবেষণা করা একটি কার্যকর পদ্ধতি, যা বিজ্ঞান বিভাগের অনেক শিক্ষকই করে থাকেন। কোথাও গবেষণা ফান্ডের জন্য চেষ্টা করলে ফান্ড পাওয়া যায়, না পেলে তিন থেকে পাঁচজন শিক্ষক মিলে নিজেদের টাকায় গবেষণা সম্ভব। এরপর যার যার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার জন্য কিছু অর্থ-সম্পদ, লাইব্রেরি, অনলাইন রিসোর্সেস এবং কারিগরি সুবিধা তো আছেই।

তাই সমন্বিতভাবে দেশের সামগ্রিক স্বার্থে তথা ভবিষৎ প্রজন্মকে নিরাপদে রাখতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ থেকে শিক্ষকরা যে গবেষণা প্রবন্ধ লিখে থাকেন, তা জার্নালে অথবা বই আকারে প্রকাশের পাশাপাশি প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় গবেষণার সার-সংক্ষেপ প্রকাশ করাটা গুরুদায়িত্ব মনে করতে হবে। যাতে দেশের সর্বস্তরের মানুষ সমাজের যে কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে পারে। নতুন জ্ঞান তৈরি করতে পারলে মিডিয়া আকৃষ্ট হবে এবং জনগণ সজাগ হবে সব ধরনের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে।

দেশ বদলাতে গেলে কাউকে না কাউকে কোথাও থেকে শুরু করতে হবে, এমনি এমনি কোনো কিছু হবে না। আর এই শুরুটা বিশ্ববিদ্যালয়েই আগে হওয়া জরুরি এবং সহজ। আমার বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয় বদলানো গেলে দেশ বদলাবে।

লিপন কুমার মণ্ডল : *পিএইচডি গবেষক, ভার্জিনিয়া টেক, যুক্তরাষ্ট্র; সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (শিক্ষা ছুটিতে)*
lipon@du.ac.bd